Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 254–263
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

আবু সয়ীদ আইয়ুবের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী ভাবনা

কুনাল দাস
এম ফিল, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : kunaldasraja1993@gmail.com

Keyword
রুশ বিপ্লব, সামন্ততন্ত্র, মার্কসবাদ, স্বৈরাচার, গণতন্ত্র, রবীন্দ্র সমালোচক, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

Abstract
বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে আবু সয়ীদ আইয়ুব একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আমরা তাঁকে চিনি মূলত রবীন্দ্র সমালোচক হিসেবে। অথচ তিনি অন্যান্য বিষয় নিয়েও নানা প্রবন্ধ লিখেছেন, যার বেশিরভাগই সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালি পাঠকের অজ্ঞাত। এর মধ্যে অন্যতম তাঁর সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধসমূহ। আইয়ুব ব্যক্তিগতভাবে মনে করেতেন সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। কোন একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির সফল রূপায়ন সম্ভব নয়। তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, স্বৈরাচার এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন হয়েছে। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়াও যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম সেই বিষয়ে বারবার আক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে। সাম্যবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আইয়ুব গৌতম বুদ্ধ ও কার্ল মার্কসের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। মানবকুলের দুঃখ ও সমস্যা– মার্কস এবং বুদ্ধদেব উভয়ের কাছেই ছিল সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পথে প্রধান অন্তরায়। সমস্যা উভয়ের কাছে এক হলেও তাদের সমাধানের পথ কিন্তু একই রকম ছিল না। কেননা দুজনে দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাগুলিকে দেখেছিলেন। আইয়ুব রুশ বিপ্লবের সুফল ও কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। দীর্ঘদিনের ধর্মকেন্দ্রিক ও সামন্ততন্ত্র তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ায় শ্রমনির্ভর সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার সূচনা ঘটে। একে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বিপ্লবগুলির মধ্যে অন্যতম বলা যেতে পারে। রুশ বিপ্লবের এই সুদূর প্রসারী প্রভাব এবং তার সাফল্যকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে এক সুন্দর সম্ভাবনাময় সমাজের আদর্শ আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। এই রুশ বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগের পাশাপাশি সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিও ভীষণভাবে প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করতেও আইয়ুব ভোলেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার চরমতম নিদর্শন দেখা যায় ব্যক্তির সৃষ্টিতে। অর্থাৎ সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায়, সংগীতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্র যদি এই সৃষ্টির উপর বেরি পড়াতে শুরু করে তবে সেই সৃষ্টি কখনোই ধ্রুপদী হতে পারে না। একথা অবশ্যই সত্য যে মার্কসবাদী আন্দোলন সাহিত্যের সীমাকে আরো বিস্তৃত করেছে। ইতিপূর্বে যে সাহিত্যগুলো লেখা হতো তার সবটাই ছিল মূলত ধর্ম নির্ভর অথবা ধনী ব্যক্তিবর্গের জীবন নির্ভর। মার্কসবাদই প্রথম সাহিত্যে এক নতুন সমাজ চেতনার অবতারণা করে। মার্কস ভক্তদের সর্বাপেক্ষা বড় সীমাবদ্ধতা যে তাঁরা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, মননকে শৃঙ্খলিত করার ঘটনাকে, অন্যায় বলে

ভাবতেই পারেন না। মার্কস স্বয়ং মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির পরিমাণগত স্তরের এবং গুণগত স্তরের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা মানবিক বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে চান। তাই আমাদের সাম্যবাদের কুফলগুলিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে এর ভালো দিকগুলিকে বাস্তবের মাটিতে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। যার ধরণা পাওয়া যায় আইয়ুবের এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে।

Discussion

বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে আবু সয়ীদ আইয়ুব একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। অবাঙালি আইয়ুবের বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', যা রবীন্দ্র পুরস্কার ও অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। আমরা তাঁকে চিনি মূলত রবীন্দ্র সমালোচক হিসেবে। অথচ তিনি অন্যান্য বিষয় নিয়েও নানা প্রবন্ধ লিখেছেন, যার বেশিরভাগই সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালি পাঠকের অজ্ঞাত। এর মধ্যে অন্যতম তাঁর সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধসমূহ। সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক এবং দলতান্ত্রিক যে রূপভেদ এবং সেই রূপভেদের আপেক্ষিক দোষ-গুণ সেগুলি তীব্র ভাবে সমালোচনার দাবি রাখে। আইয়ুব ব্যক্তিগতভাবে মনে করেতেন সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। কোন একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির সফল রূপায়ন সম্ভব নয়। তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, স্বৈরাচার এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন হয়েছে। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়াও যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম সেই বিষয়ে বারবার আক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন সমাজতন্ত্র সমষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। আর এভাবেই সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে এহেন আইয়ুবের ওপর একসময় অভিযোগ উঠেছিল সি আই এ-র অ্যাজেন্ডা তুলে ধরার। যার ফলে তাঁর সম্পাদিত কোয়েস্ট পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

'সাধু এবং সজ্জন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আইয়ুব এই দুই শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সাধু'র আভিধানিক অর্থ বলতে ধার্মিককেই বোঝায়। ধার্মিক বলতে বোঝায় যে ব্যক্তির পরম মঙ্গলময়, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি অগাধ অবিচলিত আস্থা বর্তমান। অন্যদিকে 'সজ্জন' শব্দটিকে moralist বা moral person হিসেবে প্রাবন্ধিক গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যা উপর থেকে চাপানো নয়। যা আমাদের অন্তঃকরণমূলক গুণ, তাকেই morality হিসেবে তিনি আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এখানে বিশেষ্য হিসেবে 'চারিত্র' শব্দটির অবতারণা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় যে, আবু সয়ীদ আইয়ুব আলোচ্য প্রবন্ধে এই ধর্ম এবং চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত। তার কাছে ভগবান সৃষ্ট কোন কিছুরই কোন দোষ থাকতে পারে না। বরং চারিদিকে যে সামাজিক বা মানবিক কলুষতাগুলোকে আমরা লক্ষ্য করি তা অবিদ্যাজনিত মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম মাত্র। অপরদিকে, যে ব্যক্তি সজ্জন তার কাছে চরম আদর্শ হচ্ছে মানবিক আদর্শ। এই আদর্শ অবস্থাকে সত্য করে তুলতে গেলে তাকে বাইরের অন্যায়ের সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। এভাবেই তার কাছে মনোজগতের আদর্শ ক্রমশ সত্যরূপে প্রতিভাত হতে থাকবে।

বস্তুত, মানুষের প্রতি প্রেম যার জীবনের মূল আদর্শ তার পক্ষে এই অমঙ্গলকে নিছক ধর্মতত্ত্বে বা শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রেখে সামাজিক কলুষতার প্রতি বিমুখ থাকা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তর্কাতীত ভাবে কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। যার কাছে সামাজিক অমঙ্গল দূরীকরণই ছিল জীবনের সবথেকে বড় লক্ষ্য। মার্কসের সমগ্র ধ্যান-জ্ঞান-কর্মকে এই অমঙ্গলের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম বলে ধরা যেতে পারে। অন্যদিকে ধার্মিক ব্যক্তির কাছে মনে হয় জগতের যাবতীয় বিষয় সকলই মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে। তার কাছে ঈশ্বর সৃষ্ট ঘটনার কোন কিছুই কুৎসিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ব্র্যাডলির বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন,–

"দুরাত্মার কলুষিত কামনাও এক পরমার্থিক পরম কল্যাণময় ইচ্ছার অঙ্গীভূত।"[১]

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মের ধ্বজাধারীদের সংঘাত অপেক্ষা বন্ধুত্ব হয়েছে অনেক বেশি। ধার্মিক মননের এই প্রশ্নাতীত আনুগত্য শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই আনুগত্য ছড়িয়ে পড়েছে রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও। ধর্মের প্রতি এই প্রশ্নাতীত আনুগত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে সামাজিক সংগ্রামের প্রতি নিস্পৃহ মনোভাব। সামাজিক কলুষতাকে ধর্মীয় মোড়কে পেশ করলে সংগ্রামের প্রতি বিমুখ মনোভাব জন্ম লাভ করে। সংগ্রামের প্রতি এই সামাজিক দাবির মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা থেকেই সামাজিক সমস্যাগুলিকে ছোট করে দেখার অভ্যাস জনমানসে তৈরি হয়। ধর্মের হাত ধরে মুক্তিলাভই তখন হয়ে ওঠে সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত বিষয়। সামাজিক সমস্যাগুলি সেখানে কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অপেক্ষা তার মিথ্যা অস্তিত্বের উপর বিশ্বাসই ধার্মিক ব্যক্তির কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এর ফলস্বরূপ ধার্মিক ব্যক্তির যে কর্মযোগ তা তখন একান্তই তাঁর নিজের আত্মশুদ্ধির উপলব্ধিজাত, স্বর্গে পৌঁছানোর উপায় রূপে পর্যবসিত হয়। এই মানসিকতা ক্রমে বৈপ্লবিক কাজের প্রতি নিস্পৃহা, আত্মরতি প্রভৃতি দুর্বল মননের জন্ম দেয়। যা সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করে। কার্ল মার্কসের সুতীক্ষ্ণ নৈতিকতাবোধ তাকে ধর্মীয় ধ্বজাধারী তথা সামাজিক কর্মবিমুখ এই ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত করে তোলে। প্রাবন্ধিক তাই লিখেছেন,–

> "Criticism of religion is the necessary pre-condition of all criticism. It is at heart a criticism of the the vale of misery for which religion is the promised vision."[২]

প্রাচীন ভারতবর্ষের এক মহান মনীষী বুদ্ধদেব। যিনি প্রায় একই রকম ভাবে সামাজিক উৎপীড়নের ক্ষেত্রে দেব মাহাত্ম্যের শূন্যতা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রচলিত ঐশ্বরিক ধ্যান-ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি তৎকালীন সমাজের চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। মানবকুলের দুঃখ ও সমস্যা– মার্কস এবং বুদ্ধদেব উভয়ের কাছেই ছিল সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পথে প্রধান অন্তরায়। সমস্যা উভয়ের কাছে এক হলেও তাদের সমাধানের পথ কিন্তু একই রকম ছিল না। কেননা দুজনে দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাগুলিকে দেখেছিলেন। ব্যক্তিবর্গের দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ দেখেন ব্যক্তি মানুষের অসীম কামনা-বাসনাই তাকে তৃষ্ণার দাসত্বে নিমজ্জিত করে রাখে। যা দুঃখের মূল কারণ হিসেবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। সেইজন্য বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গিক মার্গের অবতারণা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই মার্গ মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে তুলবে এবং এই প্রজ্ঞার মাধ্যমেই মানুষ বৈরাগ্যের হাত ধরে ক্রমশ নির্বাণ লাভ করবে। অন্যদিকে, মানুষের দুঃখের কারণ হিসেবে মার্কস প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অল্প সংখ্যক পুঁজিপতির হাতে সিংহভাগ সম্পদ বর্তমান এবং উৎপাদন যন্ত্রের একচেটিয়া মালিকানা। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চনা তথা সমগ্র বিশ্বের দুর্বল ব্যক্তি বর্গের উপর অত্যাচারের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থা মার্কসের মতে তখনই সম্ভব হবে যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে ভেঙে সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে পারবে।

বস্তুত, গৌতম বুদ্ধ এবং কার্ল মার্কসের নির্দেশিত পথ পরস্পরের সংশোধক তথা পরিপূরক হিসেবে আইয়ুব গণ্য করতে চান। গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের ব্যক্তি জীবনের কামনা-বাসনার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল যে তিনি সামাজিক প্রভাবগুলিকে কতকটা এড়িয়েই গিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা কারও পক্ষেই মনে আনা সম্ভব ছিল না। কারণ সমাজতন্ত্রের স্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী শক্তি এবং তাকে কাজে লাগিয়ে বস্তুকেন্দ্রিক উৎপাদন শক্তির সম্প্রসারণের যে অপরিহার্যতা তা সে সময়ে তখন কোনভাবেই বাস্তবায়িত হতে পারত না। গৌতম বুদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনের উপর অধিকতর দৃষ্টিপাত করেছিলেন, আর কার্ল মার্কসের চোখে সমস্যাটি ছিল সামাজিক এবং অর্থনীতির। এর ফলে মার্কস ব্যক্তি মানুষের সীমাবদ্ধতাকে সমস্যার ধর্তব্যের মধ্যে আনতে সক্ষম হননি। তিনি মনে করতেন, সম্পদ এবং সম্পত্তির জাতীয়করণ এবং সামন্ত ও শোষক শ্রেণীর বিলুপ্তিকরণের মাধ্যমে নতুন সামাজিক বিন্যাস তৈরি হবে। এবং তাতে বিশ্বমানবের

জৈবিক চাহিদাগুলি মিটবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসের এই দূরদৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রাবন্ধিক মার্কসের সেই মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন–

> "ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যায় এবং সামাজিক সমস্যাকে সামাজিক সমস্যার পরিভাষায় অনূদিত করা মার্ক্সীয় চিন্তা-প্রকরণের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব।"[৩]

ঈশ্বরের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং বিশ্বাস মানুষের চেতনার বিকাশের পরিপন্থী–একথা মার্কস বারবার বলেছেন। তিনি নিজেও ধর্মের ধ্বজাধারী ব্যক্তি সকলের বিরুদ্ধে চিরকাল অস্ত্র ধারণ করেছেন। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেও যে আত্মচেতনা, আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির উপায় বর্তমান; সে ব্যাপারে মার্কসের ধারণা কতটা স্পষ্ট ছিল তা নিয়ে আবু সায়ীদ আইয়ুব সন্দিহান ছিলেন। কারণ, মার্কসের নিজের লেখাতেও এই ঈশ্বর বিবর্জিত আধ্যাত্মসাধনার ধারণা পাওয়া যায় না।

'সাম্য ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে আইয়ুব রুশ বিপ্লবের সুফল ও কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। দীর্ঘদিনের ধর্মকেন্দ্রিক ও সামন্ততন্ত্র তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ায় শ্রমনির্ভর সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার সূচনা ঘটে। একে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বিপ্লবগুলির মধ্যে অন্যতম বলা যেতে পারে। রুশ বিপ্লবের এই সুদূর প্রসারী প্রভাব এবং তার সাফল্যকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে এক সুন্দর সম্ভাবনাময় সমাজের আদর্শ আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। এই রুশ বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগের পাশাপাশি সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিও ভীষণভাবে প্রয়োজন। কারণ, সমালোচনা আমাদের ভবিষ্যতের রাস্তাকেই সুদৃঢ় করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত রুশ বিপ্লব অনেকটা ঐতিহাসিকভাবে প্রাসঙ্গিকতা রাখবে ভবিষ্যতের কাছে। সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকগণ দুটি শর্তের কথা বলেছেন। যে শর্তগুলির উপর রুশ বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে– এক. উৎপাদক যন্ত্রের ব্যক্তিমালিকানা তুলে দিলে অর্থনৈতিক ক্রম আরও সুশৃংখল ও মসৃণ হচ্ছে। দুই. বেকার সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা করতে পারছে। যা এতদিনের লোভ ও লাভের ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে, তবেই বোঝা যাবে সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রাসঙ্গিকতা। রুশ বিপ্লবের আগে যে বিপ্লবগুলি সংঘটিত হয়েছিল সেগুলি থেকে রুশ বিপ্লবের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য তাকে উচ্চাসনে বসিয়েছে। যেমন রুশ বিপ্লবই দেখালো যে– ব্যক্তিগত লোভ থেকে সমাজ জীবনকে আলাদা রাখা, উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য জনগণের অভাব দূরীকরণ, নতুন ভোট পদ্ধতি, দেশ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত জনগণের মূল ব্রত জনগণের কল্যাণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের উন্নতিকল্পে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা। সর্বোপরি প্রতিটি দেশবাসীর মনে সামাজিকতা বোধের উন্মেষ ঘটানো। যাতে সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, সমাজের কাছে সে কিভাবে এবং কতটা ঋণী। সেই বোধ থেকেই প্রতিটি নাগরিক সমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য সে ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। তার সঙ্গে এতদিনের বংশগৌরব, পদমর্যাদা ইত্যাদি নিম্নবৃত্তির পরিচয়গুলোকেও সে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধা বোধ করেনি। আর এখানেই রুশ বিপ্লব তার আগের বিপ্লবগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। এর আগে ফরাসি বিপ্লব খানিকটা সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, স্বাধীনতা সম্পর্কে আপাতভাবে একটা ধারণা তৈরি করেছিল। কিন্তু তাকে সফলভাবে বাস্তবের মাটিতে ফলপ্রসূ করে তোলে রুশ বিপ্লবই।

কিন্তু এই বিপ্লবের স্বরূপ কেমন? কেমনই বা সেই বিপ্লব প্রসূত স্বাধীনতা? রুশ বিপ্লবের ফলে যে সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করেছে সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা কতটা? নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা কতটা? সে বিষয়ে আলোচনার এবং প্রশ্ন করার সময় এসেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রুশ বিপ্লব প্রসূত সাম্যবাদের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি দেখলেন যে, এই সাম্যবাদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মবিকাশ চাপা পড়ে যাচ্ছে তখন তিনিও এই বিপ্লব কতটা সার্থক সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এমনকি রাশিয়ার বিপ্লবের চরম সমর্থকও স্বাধীনতার প্রশ্নে রাশিয়াকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। আসলে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সাম্যবাদী ধারণার কথা বললেও তা এক প্রকার স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে আটকে আছে। যা বিশ্বের সকল প্রান্তের স্বাধীনতাকামী মানুষকে আশাহত করে। ডিক্টেটরশিপ এমন একটা অবস্থা যেখানে শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কোন স্বাধীন মতবাদ যা শাসকের ধারণার

সঙ্গে খাপ খায় না সেরকম কোনো বইপত্র, সংবাদপত্র, সিনেমা, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি প্রকাশ করার সুবিধা থাকে না। ছক বাঁধা সামাজিক পরিকাঠামোর বাইরে গিয়ে ব্যক্তিমানুষ প্রায় কিছুই করতে পারে না। তবে ছকের মধ্যে সে অবশ্য স্বাধীন। কেননা সেখানে সে শাসকের তথা শাসনযন্ত্রের অনুগত। আসলে এই রুশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে গিয়ে নিজের সবটা দেওয়ার স্বাধীনতা পায়। কিন্তু যা এই শাসনযন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী, তা সকলের জন্য মঙ্গলজনক হলেও সেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। যদি কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তার স্থান হবে কারাগারে। আর এখানেই স্বাধীনচেতা বিশ্ব নাগরিকগণের আপত্তি। এই আপত্তির অবশ্যই সংগত কারণ রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাম্যবাদ একপ্রকার তত্ত্বগতভাবে সর্বাঙ্গীন সুন্দর হতে পেরেছে। কিন্তু প্রায়োগিক দিক থেকে তার সীমাবদ্ধতা প্রচুর। বিশেষত যেখানে এর প্রধান ত্রুটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার হরণ, সেখানে এই ব্যবস্থাকে কোনভাবেই সর্বাঙ্গীণ সফল বলে মেনে নেওয়া যায় না।

এই ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করতেও আইয়ুব ভোলেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার চরমতম নিদর্শন দেখা যায় ব্যক্তির সৃষ্টিতে। অর্থাৎ সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায়, সংগীতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্র যদি এই সৃষ্টির উপর বেরি পড়াতে শুরু করে তবে সেই সৃষ্টি কখনোই ধ্রুপদী হতে পারে না। যে সৃষ্টি চিরন্তন, তা কখনো বহুজনের সুপরিচিত পথে প্রবাহিত হয় না। তা চলতি মত বিশ্বাস, ধারণাকে অন্ধের মত অনুসরণ করে না। বরং এই সৃষ্টি এমন কতগুলি সংগত প্রশ্ন তুলে ধরে যা সাধারণ জনমানসে আসে না। এবং এই প্রশ্নগুলিই ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। এটাই এই সৃষ্টির মহৎ গুণ, যা চিরাচরিতের বাঁধাধরা গণ্ডির বাইরে চিন্তা-ভাবনার জন্ম দেয়। আর স্বাধীনভাবে যদি শিল্পী সেই সৃষ্টি করতে না পারেন, যদি তার নির্দিষ্ট ছকে বাধা সৃষ্টিরই বহিঃপ্রকাশ হয় তবে তা কখনও চিরন্তন হয় না। স্বাধীন সৃষ্টি না হলে তাই সৃষ্টির কোন সার্থকতা নেই। আর এখানেই সোভিয়েত রাশিয়ার সীমাবদ্ধতা। শিল্পীর মৌলিকতার ধারণা রুশবিপ্লবোত্তর সময়েও দেখা যায় না। এক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের স্বপক্ষে যুক্তি দেন যে,-

> "কোনো ব্যক্তি যদি বল্গাহীন ভাবে তার স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে, অর্থাৎ সে যদি তার ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে অবাধ ভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে শুরু করে, তবে অচিরেই সে তার নিজের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়বে।"[৪]

গোঁড়া মার্ক্সিস্টরা ইতিহাসকে জড়বাদী বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তাদের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন গুরুত্ব নেই। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস উভয়ই প্রথমদিকে জড়বাদী বিষয়গুলিকে বিশেষত অর্থনীতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষের দিকের লেখায় তাঁরা ঐতিহাসিক নিয়ন্তা হিসেবে অর্থনীতির পাশাপাশি তার প্রভাবগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই প্রভাবগুলি হল মূলত আবেগজড়িত এবং মানবিক। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের প্রথমদিকের জড়বাদী ভাষ্যই গোঁড়া কমিউনিস্টরা বেশি আত্মস্থ করেছেন। তাঁরা ভেবেছেন যে, সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রণয়ন করতে পারলেই সমাজ চরম উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের মানবিক গঠনের পরিবেশের অভাব যে কোন সভ্যতাকে পশ্চাদগামী করে তুলতে পারে তা তাঁরা ভাবেন নি। আসলে মতবাদকেই সর্বস্ব জ্ঞান করে তাকে ফলিত রূপে পেতে গিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কগন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। ফলস্বরূপ যে সাম্যবাদ সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে স্বর্গের ন্যায় আদরণীয় ছিল, সোভিয়েত রাষ্ট্র সেই স্বর্গকে মর্মান্তিক এক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। আজকের দিনে সাম্যবাদের সর্বাধিক প্রাসঙ্গিকতা তার স্বরূপ সন্ধানের ভিতরেই নিহিত আছে। বিশেষত আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রাথমিক সমস্যাগুলো আজকেও পূরণ হয়নি। কিন্তু এই প্রাথমিক চাহিদার পাশাপাশি সাম্যবাদ যে ব্যক্তি মানুষের আত্মিক মুক্তির পথ হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে আমরা আশাবাদী হতেই পারি।

সাহিত্যিক এবং তাঁর সৃষ্টি সমাজ জীবনে মূল্যবোধ তথা চেতনার উন্মেষে কিভাবে ভূমিকা নেয় তা নিয়েও আবু সয়ীদ আইয়ুব আলোচনা করেছেন। এরই পাশাপাশি সৃষ্ট বিষয়টির প্রেক্ষাপট হিসেবে সাহিত্যিকের অন্তরে

সমাজচেতনা মূলক কোন ধরনের মূল্যবোধ কাজ করে বা করা উচিত তা নিয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। রাজনীতি এবং সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক হতে পারত। কিন্তু মধ্যযুগীয় প্রবণতার মতোই রাজনীতির ধারা, সাহিত্যকে আজও অবদমিত করে রেখেছে। ইউরোপে নবজাগরণের মূল বক্তব্যই ছিল মনের মুক্তি, ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা। মধ্যযুগীয় ধার্মিক মানসিকতা বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই একই প্রতিচ্ছবি আজকে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। ধর্মকে এখানে প্রতিস্থাপিত করেছে রাজনীতি এবং এই রাজনীতিই ক্রমশ মুক্তচিন্তা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে। তথাকথিত সাম্যবাদী ভাবনার ধামাধারী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মতে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির অবদান নির্ভর করে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটা কার্যকরী তার উপর। সাহিত্য রাষ্ট্রিক বিপ্লবের হাতিয়ার ছাড়াও জনগণের জীবনে শিল্প-সংস্কৃতির প্রণোদনার সৃষ্টি করে– একথা রাজনৈতিক নেতারা অস্বীকার করলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে,

> "সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিলিপি নয়, জীবনের সমালোচনা। সাহিত্যে রূপ পায় সমকালের সামাজিক সত্য, অনুরণিত হয় আগামীকালের প্রাণের স্পন্দন।"[৫]

বিপ্লবী নেতাগণ মনে করলেন যে একমাত্র সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা সাহিত্যই একমাত্র সত্য। বাকি যে কোন ধরনের সাহিত্য অপ্রাসঙ্গিক। তাঁরা শিল্পীর কাছে, তাঁর সৃষ্টির কাছে; দলতন্ত্রের মতবাদের উপর আত্মসমর্পণের দাবি করলেন। মুক্তচিন্তার উপরে এই দলীয় নেতাদের এতটাই দখলদারি যে, তাঁরা মার্কস, লেনিন বা স্ট্যালিনের মতের বাইরে কোন নতুন যুক্তিকে স্থান দিতে চাইলেন না। সে যুক্তি যতই বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-কলা, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে হোক না কেন। যুক্তি দিয়ে নতুন মতের বিরোধিতা নয়, প্রযুক্তি এবং মিথ্যার আশ্রয়ে বিরোধিতা তথা শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করা তাদের লক্ষ্য ছিল। যার পিছনে তাদের মূল যুক্তি ছিল মার্কসবাদের উপরে কিছুই হতে পারে না।

দলতন্ত্রের রাজনীতি সাহিত্যে প্রবেশ করলে তাতে সাহিত্যিকের সাহিত্যসত্তা পীড়িত হয়। কিন্তু রাজনীতির অভিঘাতে সাহিত্যিক কখনোই নিজের ঘরে তালা চাবি বন্ধ করে গণসংযোগ বা জনজীবন থেকে আত্মগোপন করেন না। একথাও স্বীকার্য যে সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন, তখন নিজের মানবিক জগতের বাইরে রাষ্ট্রনায়কের মতানুযায়ী সাহিত্য রচনা সাহিত্যিকের সাহিত্যধর্ম থেকে বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সাহিত্যিক বা শিল্পী নিজের মনোজগতের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রভাবগুলিকেও এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন,

> "কিন্তু সাহিত্যিক তো মানুষও বটে, এবং মানুষ সামাজিক জীব। যত আত্মসমাহিতই সাহিত্যিকের জীবন ও মন, সমাজের সঙ্গে নানা নিবিড় সূত্রে তা গ্রথিত। সুতরাং সমাজের জীবনপ্রবাহ, তার গভীর তলবাহী নানা স্রোত ও ধারার সংঘাত, আসন্ন বিপ্লবের আবর্ত, বিপ্লবান্তিক যে সমাজের পলি পড়েছে কোন-এক অলক্ষ্য পাড়ে তার বিবিধ কলচ্ছবি, তার বিচিত্র অনুপ্রেরণা– এই সমস্তকে তিনি এড়িয়ে চলবেন কেমন করে?"[৬]

সাহিত্য সৃষ্টির সময় সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অনুভূতির পাশাপাশি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এবং চিন্তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বভাবতই সাহিত্য স্রষ্টার পারিপার্শ্বিকতা, বৃহত্তর সমাজজীবন তাঁর সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে।

বর্তমানে সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন যদি সাহিত্য যুগোপযোগী না হয় অথবা সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুল প্রমাণিত হয় তবে সে সৃষ্টির কোন দাম নেই। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখের সৃষ্টিকেও বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত করে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমরা মহৎ সাহিত্য বলতে তাকেই বুঝি যা সমকালীন হয়েও চিরন্তনের দাবি রাখে। যেকোনো স্থান কাল নির্বিশেষে যে সাহিত্য একইরকমভাবে প্রাসঙ্গিক তা সাহিত্য হিসেবে যুগোত্তীর্ণ হয়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু সৃষ্টিই ধ্রুপদী অর্থাৎ চিরন্তন। কিন্তু কোন সাহিত্যিক যদি তাঁর রচনাকর্মের ক্ষেত্রে পুরনো গৌরবের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখেন বা বিশেষ

কোন শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন তাহলে সেই সৃষ্টি কখনোই চিরন্তন হতে পারে না। তার মধ্যে সততার লক্ষণ থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে রাজনীতি এবং সাহিত্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রাবন্ধিক যথার্থই বলেছেন,–

> "রাজনৈতিক যেমন সৎসাহিত্যকে, রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্ত্র মাত্র জ্ঞান ক'রে নিজের রাজনীতিকেই আদর্শের দিক দিয়ে হীনবল ক'রে ফেলেন, তেমনি সাহিত্যিকের পক্ষেও সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার পরিণাম আপন সাহিত্য সৃষ্টিকে ক্ষীণ এবং শৌখিন করে তোলা।"[৭]

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মাধ্যমে যে উৎপাদন ও চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল তা আজকের দিনে ক্রমশ পুঁজিবাদের রূপ নিয়েছে। এই ভাবে ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র আমাদের সমাজে চলে এসেছে। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম পরিপন্থী। এর প্রতিবাদী বিকল্প হিসেবে রাশিয়া সাম্যবাদী ভাবনার সূচনা করে। কিন্তু সাম্যবাদ বাস্তবে সেই একনায়কতন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। যেখানে সাম্যবাদের অনুগামীরা মনে করেন যে, সাময়িকভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করলে আখেরে দেশের ও দশের লাভ। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী শক্তির মূল সুরটি নিহিত আছে শক্তি প্রদর্শন এবং মানুষকে না-মানুষ রূপে দেখার মানসিকতায়। ফ্যাসিস্ট শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় তুরুপের তাস হলো ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি। বিশেষত আমাদের ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশে আজও মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মানসিকতা বর্তমান। ফলে আমাদের দেশ ফ্যাসিবাদের কবলে পড়লে স্বৈরতন্ত্র যে চরম আকার নেবে এই কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। নিজ নিজ দেশ-কালের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যতা অতীত গৌরবের ধারক ও বাহক ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে সেই অতীতকে ফিরিয়ে আনলে গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল সভ্যতার পশ্চাদ অপসারণ। সম্ভাব্য এই প্রাচীন পন্থার হাত থেকে রেহাই পেতে প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন,

> "ফ্যাসিস্ট তমসিকতার অভিযানকে ঠেকাতে কিংবা এগিয়ে দেওয়াতে সাহিত্যিক ও ভাবুকের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিকের সমাজচেতনা শুধু নঞর্থক হলে চলবে না। কী চায়না এবং কী চাই আসলে একই প্রশ্নের দুই দিক। দুটোকে একসঙ্গে না দেখলে কোনটাই পুরো দেখা হয়না, সামাজিক দৃষ্টি অপরিচ্ছন্ন থেকে যায়।"[৮]

সামাজিক বৃত্তের মধ্যে থেকেই আমাদের বেছে নিতে হবে কোন আদর্শটি অনুপ্রেরণা স্বরূপ কাজ করবে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা জনিত অর্থনৈতিক অবস্থা। এ বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নেই যে ধণতন্ত্র সার্বিকভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারে না। সুতরাং তার পরিবর্তন করা আমাদের আশু কর্তব্য। আর এই ধণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আমাদের কাছে আজ সমাজতন্ত্রের উদাহরণ রয়েছে। যা শ্রেণিবৈষম্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুনাফার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সমবন্টন এবং প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। সর্বোপরি এই সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি ব্যক্তির পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা। ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের যে লড়াই, সে ক্ষেত্রে সাহিত্যকর্মী এবং সমাজসেবীর মধ্যে সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য। কারণ ইতিহাসে দেখা যায় শোষকশ্রেণী বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এই সংগ্রামে সাহিত্যিককেও সমাজকর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তবে ধনতন্ত্রের বিলোপের ক্ষেত্রে সাহিত্যকর্মী ও সমাজকর্মীর এই সহযোগী মনোভাব যেন প্রকৃত অর্থেই সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সাহিত্যিককে তাঁর নিজের অস্তিত্বের জন্য যেন সমাজসেবীর কাছে অবহেলিত হতে না হয়। কেননা বিপ্লবের স্বার্থে উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। বিপ্লবীর কাছে সাহিত্যিক যেমন তাঁর জীবনের আরও ব্যবহারিক, বাস্তবসম্মত রূপকে স্বাক্ষর করতে পারবেন। তেমনি বিপ্লবীও সাহিত্যিকের সামাজিক দূরদর্শিতা, অনুভূতিকে রসদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।

তবে একথা অবশ্যই সত্য যে মার্কসবাদী আন্দোলন সাহিত্যের সীমাকে আরো বিস্তৃত করেছে। ইতিপূর্বে যে সাহিত্যগুলো লেখা হতো তার সবটাই ছিল মূলত ধর্ম নির্ভর অথবা ধনী ব্যক্তিবর্গের জীবন নির্ভর। মার্কসবাদই প্রথম সাহিত্যে এক নতুন সমাজ চেতনার অবতারণা করে। যেখানে সমাজের বৃহত্তর অংশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর জনগণের ভাবনা স্থান পেল সাহিত্যে। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সমাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী চরিত্র সম্পর্কে। একমাত্র সমাজতন্ত্রের অবচেতনে গঠিত হওয়া স্বৈরতন্ত্রই সাম্যবাদী ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে। ধনতন্ত্রের বিকল্প সমাজতন্ত্রই– একথা সত্যি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যাতে গণতন্ত্রও স্থান পায় সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী বিপ্লবীগন মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে, ডিক্টেটরশিপ আপাতত রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। তাঁদের মতে যেদিন রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন দরকার থাকবে না সেদিন এই স্বৈরতন্ত্র নিজে থেকেই বিলুপ্ত হবে। সেদিন মানুষের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ থাকবে না। গঠিত হবে মুক্ত সমাজ। কার্ল মার্কস এই ধারণাই মনে মনে লালন করতেন। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন–

> "মার্কসের ধারণা ছিল কতকটা এইরূপ; তাই তিনি ভবিষ্যদ্ বাণী করেছিলেন যে সমজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে শোষকশ্রেণী অবলুপ্ত হলেই রাষ্ট্রের পাট তুলে দেওয়ার দিন আসবে, মানুষের পুনরুজ্জীবিত এবং উন্নীত যৌথবৃত্তিই তাকে স্বাধীন অথচ সুশৃঙ্খলিত জীবন যাপন করবার পথ বাতলে দেবে। অল্পকালের জন্য একটি মধ্যবর্তী অবস্থার প্রয়োজন হবে বটে– যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলিটেরিয়ট। এই স্বল্প সময়টুকু অতিবাহিত হবে ভূতপূর্ব শোষক শ্রেণীর শিকড়গুলিকে চারিদিক থেকে নির্মূল করতে।"[৯]

সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা রাষ্ট্রের হাতে দিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আরো সংগঠিত হয়। এর উদাহরণ আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি। রাষ্ট্রের ভূমিকা এক্ষেত্রে সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্যতা রক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার মতগুলির, শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। একই সঙ্গে মানুষের সহজাত যেসব আদিম প্রবৃত্তি, সেগুলিকে পরিস্রুত না করা গেলে রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যে সমাজ ব্যবস্থার ছবি আমরা কল্পনা করি তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। ইতিহাস ঘাটলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি শিল্প বিপ্লবের সূচনার ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরা বিনিয়োগে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ঢালতেন। একই রকমভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে কমিউনিস্ট দলের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার ফলে রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে যে ডিক্টেটরশিপ মানসিকতার জন্ম হয়েছে, তা এককথায় সাম্যবাদীতার ক্ষেত্রে আত্মঘাতী বলেই প্রতিপন্ন হয়। এই ডিক্টেটরশিপ মানসিকতার ফলে সাম্যবাদের যে ধারণা, তা ক্রমশ ধ্বংস হতে পারে। কারণ এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এবং শাসকগণের মধ্যে তৈরি হয় একচেটিয়া ক্ষমতা।

ধনতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থায় গণতন্ত্র যে মূল লক্ষ্য নয়, উপরন্তু শোষকশ্রেণী সিংহভাগ সাধারণ নাগরিককে যে ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা দিতে অপারগ সেকথা ইতিহাসেই দেখতে পাই। কিন্তু সাম্যবাদ মানেই যে গণতন্ত্রের পতাকা পতপত করে উড়বে, এরও কোন মানে নেই। নানা মত ও পথের মুক্ত আলোচনা, সমালোচনা, বাক স্বাধীনতা হল গণতন্ত্রের মূল কথা। সেক্ষেত্রে সাম্যবাদী সোভিয়েত গণতন্ত্রকে কতখানি মর্যাদা দেবে, তা আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তার সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজতন্ত্র পুরো দুনিয়ায় ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তার প্রসারের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের ডিক্টেটরশিপ অথবা দলতন্ত্রের একনায়কতন্ত্রের মেজাজ।

পরিকল্পনামাফিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু সাংস্কৃতিক কর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির মত অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয় না। কারণ শিল্প-সংস্কৃতির মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে সত্যের স্বরূপকে ব্যক্তি স্বরূপের মধ্যে অনুসন্ধানের মধ্যে। প্রতিভাবান শিল্পী স্বাতন্ত্র এই সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করে। আর তাদের কণ্ঠরোধ সমাজকে আবদ্ধ জলাশয় পরিণত করে। শিল্পীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে জড়জগতের ভূমিকাকে স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি যে, তার

সৃষ্টি জগতকে অতিক্রম করে ক্রমশ চিরন্তনের লক্ষ্যে যাত্রা করে। প্রতিভাবান শিল্পীর এই স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তাই বলেছেন,–

> "কোন-এক কাল ও শ্রেণীর শিল্পে একটি বিশেষ অর্থনীতির ছায়াপাত থাকলেও তার উপর যদি প্রতিভার ছাপ পড়ে তবে সে আপন দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে রসের আনন্দ বহন করে নিয়ে যাবে সর্বদেশ ও শাশ্বত কালের কাছে; কোনো শ্রেণী তাকে অন্য শ্রেণী সঞ্জাত বলে অবজ্ঞা করতে পারবে না।"[১০]

মার্কস ভক্তদের সর্বাপেক্ষা বড় সীমাবদ্ধতা যে তাঁরা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, মননকে শৃঙ্খলিত করার ঘটনাকে, অন্যায় বলে ভাবতেই পারেন না। মার্কস স্বয়ং মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির পরিমাণগত স্তরের এবং গুণগত স্তরের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা মানবিক বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে চান। তাই তাদের কাছে অর্থ শুধুমাত্র বিপ্লবের অস্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়। বিপ্লবের বাইরে তাই তারা শিল্পের মৌলিক সত্তাকে গ্রহণ করতে অক্ষম। তারা বুঝতে চান না স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যমে, সমালোচনার মাধ্যমে আমরা ক্রমাগত সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রনেতাদেরও এটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রতিটি ব্যক্তির মঙ্গল হলে তবেই সমগ্র সমাজের, সমষ্টির উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং, সমষ্টিগত ভাবে উন্নয়নের ফলাফল পেতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে নজর দিতে হবে। আরও একটি কথা সর্বকালে, সব দেশেই সত্য; তা হল ধনতান্ত্রিক স্বাধীনতার ও স্বৈরাচারী সাম্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ধনতান্ত্রিক স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকগণ যে স্বাধীনতার কথা বললেন তা ক্রমশ শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে। অন্যদিকে স্বৈরাচারী সাম্যবাদীরা বলেন যে রাষ্ট্রের সুষম গঠনের প্রয়োজনেই স্বাধীনতাকে আজ সাময়িকভাবে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। কিন্তু তা যে সত্য নয়, একথা সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত সামনে রাখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

সর্বোপরি তাই বলা যায়, সাহিত্যিক যেন তার স্বধর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত না হন। সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ এবং সুন্দরের সাধনা তার স্বধর্ম। সমাজবীক্ষণকে তাঁর সুন্দরের সাধনা যে ভাবে প্রভাবিত করবে, অনুরূপভাবে সমাজবোধও তার সৌন্দর্যের ধারণাকে নব নব রূপে সমৃদ্ধ করবে। সাহিত্যিককে খেয়াল রাখতে হবে সাহিত্যের মূল ভূমিকা হল রস সৃজনের মাধ্যমে পাঠককে আনন্দ দান করা। সমাজের প্রতি আবেদন সাহিত্যিকের লেখায় ভীষণ ভাবে ফুটে উঠলেও তা যদি পাঠককুলের আনন্দের তৃষ্ণা নিবারণ করতে অক্ষম হয় বা ব্যর্থ হয় তবে শাশ্বতের আঙিনায় কোন উল্লেখযোগ্য স্থান পায় না। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, উৎপাদিত দ্রব্যের সমানভাবে বন্টন, ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল– জনগণের প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন ও সমবন্টন, শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা প্রদান, প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া যার সবটাই সমষ্টি কেন্দ্রিক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেখানে গৌণ বিষয়। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত অর্থনৈতিক ও সমবন্টনমূলক ক্ষেত্রগুলির সুবিধার জন্য। এখানে সুনিয়ন্ত্রণ দরকার, তা না হলে এই গণতন্ত্রও একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণের দূরদর্শিতা, বিশেষত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে সমাজে প্রচুর উৎপাদন ঘটাতে সক্ষম সে বিষয়ে উদারমনস্ক হতে হবে। কেননা সুস্থ মন, মানসিকতার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অর্থাৎ গণতন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ বলতে ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বাস্তবায়নকেই বোঝানো হয়। গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি নাগরিকের মতামত আলাদা। তাদের সবার মতকে একটি সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে একত্রিত না করলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি হবে না। আর এই সামঞ্জস্য বিধানের কাজটি দৃঢ় হাতে করে একনায়কতন্ত্র। সুতরাং এই একনায়কতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে অতি শীঘ্র, গণতন্ত্রের প্রতিভূ যারা তাদের উচিত একটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছানো। না হলে স্বৈরাচারী প্রবৃত্তি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেবে।

উনবিংশ শতকের উদারবাদী বক্তাদের মত ছিল যে– ব্যক্তি মানুষের উপর বাহ্যিক বা সামাজিক কোন চাপ না পড়লে নিজের মনোজগতেই সেই ব্যক্তি পূর্ণ হবার, নিজের বিকাশের রসদ খুঁজে পাবে। কিন্তু সমাজ ব্যক্তি মানুষের উপর প্রভাব ফেলবেই। অভ্যাস বা অধ্যাবসায়ের ফলে ব্যক্তি হয়তো কিছুটা সামাজিক প্রভাব কাটাতে পারে, তবে সম্পূর্ন নয়। আর তা কাম্যও নয়। বরং গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষ সমাজের সম্পূর্ণ অধীন না থেকেও যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে, সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত। এটাই গণতন্ত্রের মূল সুর। গণতন্ত্রই প্রত্যেককে স্বাতন্ত্রবোধ

সম্পর্কে সচেতন করে, ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে নিজের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সর্বোপরি অন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত না করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখে এবং পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। কিন্তু এসব স্বৈরতন্ত্র বা ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

তথ্যসূত্র :

১. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, 'সাধু এবং সজ্জন', পথের শেষ কোথায় এবং পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৬৭
২. ঐ, পৃ. ৬৮
৩. ঐ, পৃ. ৭০
৪. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ১৪৯
৫. দাস, ধনঞ্জয় (সম্পা.), 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি', মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ২৯
৬. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, 'সাহিত্যিকের সমাজচেতনা', ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ৬৪
৭. ঐ, পৃ. ৬৫
৮. ঐ, পৃ. ৬৬
৯. ঐ, পৃ. ৬৯
১০. ঐ, পৃ. ৭৫